মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতির প্রভাব

ধারণা পাঠ: ইতিহাস বিভাগ: শান্তিপুর কলেজ: পঞ্চম সেমিস্টার: 12/12/2025

সুদীপ্ত সাধুখাঁ

মুঘল দরবারে ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী দল বা গোষ্ঠীগুলোর রাজনীতি ছিল সাম্রাজ্যিক প্রশাসনের অন্যতম নির্ধারক উপাদান, যা ক্ষমতার ভারসাম্য, নীতিনির্ধারণ, শাসক-অনুগত্য এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই গোষ্ঠীগুলি মূলত জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই মুঘল রাষ্ট্রযন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধারাবাহিকভাবে এদের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে মুঘল রাজনীতির ওঠানামা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুঘল শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অনেকটাই নির্ভর করত সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর। আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটরা দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের সাহায্যে সাম্রাজ্যের ঐক্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে ঔরঙ্গজেব এর রাজত্বকালের অন্তিম লগ্নে সাম্রাজ্যে সাংগঠনিক দিকগুলো ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারী পক্ষে এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি, ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

মুঘল রাজবংশের সূচনালগ্নে তুরানী (মধ্য এশীয় তুর্কি) অভিজাতরা ছিল সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি। বাবরের সেনাবাহিনী ও প্রশাসন প্রধানত তুর্কো-মোঙ্গল ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল। হুমায়ূনের সিংহাসনচ্যুতি এবং পারস্যে আশ্রয়ের অভিজ্ঞতা তাকে ইরানী অভিজাতদের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে। হুমায়ূন ভারতে পুনরায় ফিরে এসে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ইরানি গোষ্ঠীর প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। আকবর প্রথম শাসক যিনি ইরানী ও তুরানী গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণে এনে "ভারসাম্যনীতির" ভিত্তিতে প্রশাসন সাজান। তিনি ইরানী-তুরানী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রশমিত করতে রাজপুত ও হিন্দুস্থানী (স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রশাসনিক অভিজাত) গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেন। আকবরের মানসবদারি ব্যবস্থা এই তিন গোষ্ঠীর ক্ষমা-বন্টনে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সৃষ্টি করে। তার শাসনে দরবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

থাকলেও তা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং আকবর প্রত্যেক গোষ্ঠীকে অপরটির ভারসাম্য রক্ষার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন।

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে ইরানি দল বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের পিতৃ-সম্পর্কিত তুরানী অভিজাতরা কিছুটা দুর্বল হয়, এবং নূরজাহান ও তার পরিবারের মাধ্যমে ইরানি দল দরবারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। শাহজাহানের যুগে প্রশাসন আরও পারসি-প্রভাবিত হয়—বিরোক্রেসি, কূটনীতি, সাহিত্যচর্চা ও আদালতের আচরণে ইরানি রীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে একই সময়ে তুরানী দল সামরিক দপ্তরে শক্ত অবস্থান বজায় রাখে এবং দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়মিত চলতে থাকে। সতীশ চন্দ্র ও আতাহার আলী দেখিয়েছেন যে, মুঘল দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বপ্রকৃতপক্ষে জায়গিরদারি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎকৃষ্ট জায়গির জন্য তাদের মধ্যে রেষারেষি মুঘল শাসক শ্রেণীর মধ্যে সুপ্ত বিভাজক শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলেছিল। দরবারে সবথেকে প্রভাবশালী দলে সমর্থকদের মধ্যে উৎকৃষ্ট জায়গিরগুলি বন্টন হত। সব দলই চাইতো ওয়াজির বা মীর বক্সীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি উপরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে।

ঔরঙ্গজেবের শাসন কালে তিন গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব আবারও তীব্র হয়ে ওঠে। ইরানি অভিজাতরা প্রশাসনিক দায়িত্বে প্রভাবশালী থাকলেও তুরানীরা সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখে। আওরঙ্গজেব নিজে দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় হিন্দুস্থানী দল, বিশেষত দাক্ষিণী মুসলিম ও মারাঠা-উদ্ভূত কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করতে থাকেন। এর ফলে পুরনো ইরানি-তুরানী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অসন্তোষ বাড়ে এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনে factionalism গভীর সংকট তৈরি করে। আর ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল অভিজাতরা প্রধানত তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যথা- ইরানি, তুরানি, হিন্দুস্তানি। ইরানি দলের নেতা ছিলেন আসদ খান এবং তার পুত্র জুলফিকার খান। তুরানি দলের নেতা ছিলেন ফিরোজ জঙ্গ এবং তার পুত্র চিনকিলিস খান। হিন্দুস্তানি দলের নেতা ছিলেন আফগান নেত্রিবৃন্দ, সৈয়দ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং খান-ই-দোরান এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ। সতীশ চন্দ্র বলেছেন, দলগুলি জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি, দলগুলির মূল ভিত্তি ছিল পাস্পরিক সম্পর্কে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং সর্বোপরি স্বার্থবোধ।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত গৃহযুদ্ধের সময় মুনিম খান দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। দিল্লির সিংহাসনে বসার পর বাহাদুর শাহ আসদ খানের স্থানে মুনিম খানকে ওয়াজির পদে নিযুক্ত করেন। আসদ খানকে লাহোর ও দিল্লির সুবেদার পদে নিযুক্ত করা হয় এবং চিনকিলিস খানকে সাত হাজারি মনসবদারি পদে নিযুক্ত করা হয়। ফিরোজ জঙ্গ গুজরাটে শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। এই অবস্থায় তুরানি গোষ্ঠী বিভিন্ন রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেই।

1711 খ্রিস্টাব্দে মুনিম খানের মৃত্যু হলে ওয়াজির পদ দখলের লড়াই নতুন করে আরম্ভ হয়। প্রধান দাবিদার জুলফিকার খানের বিরোধী ছিল শাহজাদা আজিজ-উস-খান| 1712 খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তার অপর তিন পুত্রদের জুলফিকার আজিজ উস খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেন। আজিজ-উস-খান নিহত হওয়ার পর জুলফিকার খান জাহান্দর শাহকে সিংহাসনে বসলেন এবং তিনি নিজে ওয়াজির পদের দায়িত্ব নেন এবং জুলফিকার খান প্রকৃত শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

জাহান্দর শাহের আমলে মুঘল দরবারে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ ধারণ করে। ওয়াজিরকে সরানোর জন্য জাহান্দর শাহ গোপন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেই। এই কাজে তিনি সঙ্গী হিসাবে পান মীর বক্সী, কোকলাতাস ও তার অনুগামীদের। সতীশ চন্দ্র বলেছেন, এর ফলে এক দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর প্রভাব প্রত্যেকটি বিভাগে পড়েছিল। এই অবস্থায় 1713 খ্রিস্টাব্দে ফারুকসিয়ার জাহান্দর শাহকে পরাস্ত করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ফারুকসিয়া তার সাহায্যকারী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ সৈয়দ আব্দুল খাকে ওয়াজির এবং সৈয়দ হুসেন আলীকে মীর বক্সী বলে বসানো হয়। এর ফলে দরবারে হিন্দুস্তানি গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তুরানি গোষ্ঠীর নেতাদের সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম থেকেই ফারুকসিয়া তাদের তাদের সম্পর্কে তিক্ত হয়ে উঠে। ফারুকশিয়ার দুই প্রিয় পাত্র মীর জুমলা ও খান-ই-দোরানের শহীদ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। তাই ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র লিখেছেন যে, "এই সময়ের ইতিহাস ছিল ফারুকসিয়া ও সৈয়দ

ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষমতার একটানা সংকটের ইতিহাস'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইরানি, তুরানি ও অভিজাত গোষ্ঠী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

সতীশ চন্দ্র, মধ্যযুগে ভারত
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা
অনিরুদ্ধ রায়, মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস